রক্তমুখী নীলা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১. ব্যোমকেশ পা নাচাইতেছিল 2

০২. হতভম্ব মহারাজ 19

০১. ব্যোমকেশ পা নাচাইতেছিল

টেবিলের উপর পা তুলিয়া ব্যোমকেশ পা নাচাইতেছিল। খোলা সংবাদপত্রটা তাহার কোলের উপর বিস্তৃত। শ্রাবণের কর্মহীন প্রভাতে দু'জনে বাসায় বসিয়া আছি; গত চারদিন ঠিক এইভাবে কাটিয়াছে। আজকারও এই ধারাভ্রাবি ধূসর দিনটা এইভাবে কাটিবে, ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিলাম।

ব্যোমকেশ কাগজে মগ্ন; তাহার পা স্বেচ্ছামত নাচিয়া চলিয়াছে। আমি নীরবে সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি; কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলার অভ্যাস যেন ক্রমে ছুটিয়া যাইতেছে।

কিন্তু চুপ করিয়া দু'জনে কাঁহাতক বসিয়া থাকা যায়? অবশেষে যা হোক একটা কিছু বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলাম, 'খবর কিছু আছে?'

ব্যোমকেশ চোখ না তুলিয়া বলিল, 'খবর গুরুতর-দু'জন দাগী আসামী সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে।'

একটু আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে তাঁরা? 'একজন হচ্ছেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন—তিনি মুক্তিলাভ করেছেন বিচিত্রা নামক টকি হাউসে; আর একজনের নাম শ্রীযুত রমানাথ নিয়োগী-ইনি মুক্তিলাভ করেছেন আলিপুর জেল থেকে। দশ দিনের

পুরনো খবর, তাই আজ ‘কালকেতু’ দয়া করে জানিয়েছেন।’ বলিয়া সে ক্রুদ্ধ-হতাশ ভঙ্গীতে কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুঝিলাম সংবাদের অপ্রচুর্যে বেচারা ভিতরে ভিতরে ধৈর্য হারাইয়াছে। অবশ্য আমাদের পক্ষে নৈষ্কর্মের অবস্থাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলিয়া এই বর্ষার দিনে তাজা মুড়ি-চালভাজার মত সংবাদপত্রে দু’ একটা গরম গরম খবর থাকিবে না-ইহাই বা কেমন কথা। বেকারের দল তবে বাঁচিয়া থাকিবে কিসের আশায়?

তবু, ‘নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।’ বলিলাম, ‘শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনকে তো চিনি, কিন্তু রমানাথ নিয়োগী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। তিনি কে?’

ব্যোমকেশ ঘরময় পায়চারি করিল, জানোলা দিয়া বাহিরে বৃষ্টি-ঝাপ্সা আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, তারপর বলিল, ‘নিয়োগী মহাশয় নিতান্ত অপরিচিত নয়। কয়েক বছর আগে তাঁর নাম খবরের কাগজে খুব বড় বড় অক্ষরেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের স্মৃতি এত হ্রস্ব যে দশ বছর আগের কথা মনে থাকে না।’

‘তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো পেলুম না। কে তিনি?’

‘তিনি একজন চোর। ছিচকে চোর নয়, ঘটিবাটি চুরি করেন না। তাঁর নজর কিছু উঁচু—‘মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।’ বুদ্ধিও যেমন অসাধারণ সাহসও তেমনি অসীম।’–ব্যোমকেশ স-খেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, ‘আজকাল আর এরকম লোক পাওয়া যায় না।

বলিলাম, 'দেশের দুভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নাম বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজে উঠেছিল। কেন?'

'কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হয়েছিল।' টেবিলের উপর সিগারেটের টিন রাখা ছিল, একটা সিগারেট তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ যত্ন সহকারে ধরাইল; তারপর আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'দশ বছর হয়ে গেল। কিন্তু এখনও ঘটনাগুলো বেশ মনে আছে। তখন আমি সবেমাত্র এ কাজ আরম্ভ করেছি।–তোমার সঙ্গে দেখা হবারও আগে–'

দেখিলাম, ঔদাস্যভরে বলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই নিজের স্মৃতিকথায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বষ্যর দিনে যখন অন্য কোনও মুখরোচক খাদ্য হাতের কাছে নাই, তখন স্মৃতিকথাই চলুক-এই ভাবিয়া আমি বলিলাম, 'গল্পটা বল শুনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্প কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা কারণে রহস্যময় হয়ে আছে। পুলিস খেটেছিল খুব এবং বাহাদুরিও দেখিয়েছিল অনেক। কিন্তু আসল জিনিসটি উদ্ধার করতে পারেনি।'

'আসল জিনিসটি কি?'

‘তবে বলি শোন। সে সময় কলকাতা শহরে হঠাৎ জহরত চুরির খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল; আজ জহরলাল হীরালালের দোকানে চুরি হচ্ছে, কাল দত্ত কোম্পানির দোকানে চুরি হচ্ছে-এই রকম ব্যাপার। দিন পনেরোর মধ্যে পাঁচখানা বড় বড় দোকান থেকে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকার হীরা জহরত লোপাট হয়ে গেল। পুলিস সজোরে তদন্ত লাগিয়ে দিলে।

‘তারপর একদিন মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের বাড়িতে চুরি হল। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের পরিচয় দিয়ে তোমায় অপমান করব না, বাঙালীর মধ্যে তাঁর নাম জানে না। এমন লোক কমই আছে। যেমন ধনী তেমনি ধার্মিক। তাঁর মত সহৃদয় দয়ালু লোক আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি তিনি একটু বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন—কিন্তু সে থাক। ভাল ভাল জহরত। সংগ্রহ করা তাঁর একটা শখ ছিল; বাড়িতে দোতলার একটা ঘরে তাঁর সংগৃহীত জহরতগুলি কাচের শো-কেসে সাজান থাকত। সতর্কতার অভাব ছিল না; সেপাই সাস্ত্রী চৌকিদার অষ্টপ্রহর পাহারা দিত। কিন্তু তবু একদিন রাত্রিবেলা চোর ঢুকে দু’জন চৌকিদারকে অজ্ঞান করে তাঁর কয়েকটা দামী জহরত নিয়ে পালাল।

‘মহারাজের সংগ্রহে একটা রক্তমুখী নীলা ছিল, সেটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নীলাটাকে মহারাজ নিজের ভাগ্যলক্ষ্মী মনে করতেন; সর্বদা আঙুলে পরে থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন আগে সেটা আংটিতে আলগা হয়ে গিয়েছিল বলে খুলে রেখেছিলেন। বোধহয় ইচ্ছে ছিল, স্যাকরা ডাকিয়ে মেরামত করে আবার আঙুলে পরবেন। চোর সেই নীলাটাও নিয়ে গিয়েছিল।

‘নীলা সম্বন্ধে তুমি কিছু জোন কি না বলতে পারি না। নীলা জিনিসটা হীরে, তবে নীল হীরে। অন্যান্য হীরের মত কিন্তু কেবল ওজনের ওপরই এর দাম হয় না; অধিকাংশ সময়–অন্তত আমাদের দেশে–নীলার দাম ধার্য হয় এর দৈবশক্তির ওপর। নীলা হচ্ছে শনিগ্রহের পাথর। এমন অনেক শোনা গেছে যে পয়মন্ত নীলা ধারণ করে কেউ কোটিপতি হয়ে গেছে, আবার কেউ বা রাজা থেকে ফকির হয়ে গেছে। নীলার প্রভাব কখনও শুভ কখনও বা ঘোর অশুভ।

‘একই নীলা যে সকলের কাছে সমান ফল দেবে তার কোনও মানে নেই। একজনের পক্ষে যে নীলা মহা শুভকর, অন্যের পক্ষে সেই নীলাই সর্বনেশে হতে পারে। তাই নীলার দাম তার ওজনের ওপর নয়। বিশেষত রক্তমুখী নীলার। পাঁচ রতি ওজনের একটি নীলার জন্যে আমি একজন মাড়োয়ারীকে এগারো হাজার টাকা দিতে দেখেছি। লোকটা যুদ্ধের বাজারে চিনি আর লোহার ব্যবসা করে ডুবে গিয়েছিল, তারপর-; কিন্তু সে গল্প আর একদিন বলব। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু নই, ভূত-প্রেত মারণ-উচাটন বিশ্বাস করি না। কিন্তু রক্তমুখী নীলার অলৌকিক শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস।

‘সে যাক, যা বলছিলুম। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের নীলা চুরি যাওয়াতে তিনি মহা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন। তাঁর প্রায় পাঁচশ ত্রিশ হাজার টাকার মণি-মুক্তো চুরি গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাছে নীলাটা যাওয়াই সবচেয়ে মমস্তিক। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে চোর ধরা পড়ুক আর না পাড়ুক, তাঁর নীলা যে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে তিনি দু’হাজার

টাকা পুরস্কার দেবেন। পুলিস তো যথাসাধ্য করছিলই, এখন আরও উঠে পড়ে লেগে গেল। পুলিসের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা নির্মলবাবু তদন্তের ভার গ্রহণ করলেন।

'নির্মলবাবুর নাম বোধ হয় তুমি শোননি, সত্যিই বিচক্ষণ লোক। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল, এখন তিনি রিটায়ার করেছেন। যা হোক, নির্মলবাবু তদন্ত হাতে নেবার সাত দিনের মধ্যেই জহরত-চোর ধরা পড়ল। চোর আর কেউ নয়–এই রমানাথ নিয়োগী। তার বাড়ি খানাতল্লাস করে সমস্ত চোরাই মাল বেরুল, কেবল সেই রক্তমুখী নীলাটা পাওয়া গেল না।

'তারপর যথাসময়ে বিচার শেষ হয়ে রমানাথ বারো বছরের জন্যে জেলে গেল। কিন্তু নীলার সন্ধান তখনও শেষ হল না। রমানাথ কোনও স্বীকারোক্তি করলে না, শেষ পর্যন্ত মুখ টিপে রইল। ওদিকে মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ পুলিসের পিছনে লেগে রইলেন। পুরস্কারের লোভে পুলিস অনুসন্ধান চালিয়ে চলল।

'রমানাথ জেলে যাবার মাস তিনেক পরে নির্মলবাবু খবর পেলেন যে নীলাটা রমনাথের কাছেই আছে, কয়েকজন কয়েদী নাকি দেখেছে। জেলে পুলিসের গুপ্তচর কয়েদীর ছদ্মবেশে থাকে তা তো জান, তারাই খবর দিয়েছে। খবর পেয়ে নির্মলবাবু হঠাৎ একদিন রমানাথের 'সেলে গিয়ে খানাতল্লাস করলেন, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। রমানাথ তখন আলিপুর জেলে ছিল, কোথায় যে নীলাটা সরিয়ে ফেললে কেউ খুঁজে বার করতে পারলে না।

‘সেই থেকে নীলাটা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে। পুলিস অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হল ছেড়ে দিয়েছে-?

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল , ‘মন্দ প্রবলেম নয়। এলাচের মত একটা নীল রঙের পাথর-একজন জেলের কয়েদী সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখলে! কেসটা যদি আমার হাতে আসত চেষ্টা করে দেখতুম। দু’হাজার টাকা পুরস্কারও ছিল—’

ব্যোমকেশের অর্ধ স্বগতোক্তি ব্যাহত করিয়া সিঁড়ির উপর পদশব্দ শোনা গেল। আমি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, ‘লোক আসছে। ব্যোমকেশ, বোধ হয় মক্কেল।’

ব্যোমকেশ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, ‘বুড়ো লোক, দামী জুতো-এই বর্ষাতেও মচমচ করছে; সম্ভবত গাড়িমোটরে ঘুরে বেড়ান, সুতরাং বড় মানুষ। একটু খুঁড়িয়ে চলেন।’—হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, ‘অজিত, তাও কি সম্ভব? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ তো প্রকাণ্ড একখানা রোলস রয়েস সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিনা-আছে। ঠিক ধরেছি তাহলে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ, অজিত! যাঁর কথা হচ্ছিল। সেই মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ আসছেন–কেন আসছেন জান?’

আমি সোৎসাহে বলিলাম, ‘জানি, খবরের কাগজে পড়েছি। তাঁর সেক্রেটারি হরিপদ রক্ষিত সম্প্রতি খুন হয়েছে-সেই বিষয়ে হয়তো—’

দ্বারে টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া ব্যোমকেশ আসুন মহারাজ বলিয়া যে লোকটিকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল, সাময়িক কাগজ-পত্রে তাঁহার অনেক ছবি দেখিয়া থাকিলেও আসল মানুষটিকে এই প্রথম চাক্ষুষ করিলাম। সঙ্গে লোকলিস্করের আড়ম্বর নাই—অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের মানুষ; ঈষৎ রুগ্ন ক্ষীণ চেহারা–পায়ের একটা দোষ থাকাতে একটু খোঁড়াইয়া চলেন। বয়স বোধ করি ষাট পার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বার্ধক্যের লোলচর্ম তাঁহার মুখখানিকে কুৎসিত করিতে পারে নাই–বরং একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতা মুখের জরাজনিত বিকারকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

মহারাজ একটু হাসিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময়ও প্রকাশ পাইল। বলিলেন, ‘আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি আসব সেটা কি আগে থাকতে অনুমান করে রেখেছিলেন নাকি?’

ব্যোমকেশও হাসিল। ‘এত বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও পারিনি। কিন্তু আপনার সেক্রেটারির মৃত্যুর কোন কিনারাই যখন পুলিস করতে পারল না, তখন আশা হয়েছিল হয়তো মহারাজ স্মরণ করবেন। কিন্তু আসুন, আগে বসুন।’

মহারাজ চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘হ্যাঁ, আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল, পুলিস তো কিছুই করতে পারলে না; তাই ভাবলুম দেখি যদি আপনি কিছু করতে পারেন। হরিপদর ওপর আমার একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল—তা ছাড়া তার মৃত্যুর

ধরণটাও এমন ভয়ঙ্কর–' মহারাজ একটু থামিলেন—'অবশ্য সে সাধু লোক ছিল না; কিন্তু আপনারা তো জানেন, ঐরকম লোককে সৎপথে আনবার চেষ্টা করা আমার একটা খেয়াল। আর, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে হরিপদ নেহাত মন্দ লোক ছিল না। কাজকর্ম খুবই ভাল করত; আর কৃতজ্ঞতাও যে তার অন্তরে ছিল। সে প্রমাণও আমি অনেকবার পেয়েছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মাপ করবেন, হরিপদবাবু সাধু লোক ছিলেন না, এ খবর তো জানতুম না। তিনি কোন দুষ্কার্য করেছিলেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'সাধারণে যাকে দাগী আসামী বলে, সে ছিল তাই। অনেকবার জেলা খেটেছিল। শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে যখন আমার কাছে–'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দয়া করে সব কথা গোড়া থেকে বলুন। খবরের কাগজের বিবরণ আমি পড়েছি বটে, কিন্তু তা এত অসম্পূর্ণ যে, কিছুই ধারণা করা যায় না। আপনি মনে করুন, আমরা কিছুই জানি না। সব কথা আপনার মুখে স্পষ্টভাবে শুনলে ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধা হবে।'

মহারাজ বলিলেন, 'বেশ, তাই বলছি।' তারপর গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'আন্দাজ মাস ছয়েকের কথা হবে; ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হরিপদ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আগের দিন জেল থেকে বেরিয়েছে, আমার কাছে কোন কথাই গোপন করলে না। বললে, আমি যদি তাকে সৎপথে চলাবার

একটা সুযোগ দিই, তাহলে সে আর বিপথে যাবে না। তাকে দেখে তার কথা শুনে দয়া হল। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচেই, কিন্তু এরি মধ্যে বার চারেক জেল খেটেছে। শেষবারে চুরি, জালিয়াতি, নাম ভাঁড়িয়ে পরের দস্তখতে টাকা নেওয়া ইত্যাদি কয়েকটা গুরুতর অপরাধে লম্বা মেয়াদ খেটেছে। দেখলুম, অনুতাপও হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার? বললে, লেখাপড়া বেশি শেখবার অবকাশ পাইনি, উনিশ বছর থেকে ক্রমাগত জেলই খাটছি। তবু নিজের চেষ্টায় সর্টহ্যান্ড টাইপিং শিখেছি; যদি দয়া করে আপনি নিজের কাছে রাখেন, প্রাণ দিয়ে আপনার কাজ করব।

'হরিপদকে প্রথম দেখেই তার ওপর আমার একটা মায়া জন্মেছিল; কি জানি কেন, ঐ জাতীয় লোকের আবেদন আমি অবহেলা করতে পারি না। তাই যদিও আমার সর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের দরকার ছিল না, তবু পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে তাকে নিজের কাছে রাখলুম। তার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। কাছেই একখানা ছোট বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগিল।

'কিছুদিনের মধ্যেই দেখলুম, লোকটি অসাধারণ কর্মপটু আর বুদ্ধিমান; যে কাজ তার নিজের নয়। তাও এমন সুচারুভাবে করে রাখে যে কারুর কিছু বলবার থাকে না। এমন কি, ভবিষ্যতে আমার কি দরকার হবে তা আগে থাকতে আন্দাজ করে তৈরি করে রাখে। মাসে দুই যেতে না যেতেই সে আমার কাছে একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠল। হরিপদ না হলে কোন কাজই চলে না।

‘এই সময় আমার প্রাচীন সেক্রেটারি অবিনাশবাবু মারা গেলেন। আমি তাঁর জায়গায় হরিপদকে নিযুক্ত করলুম। এই নিয়ে আমার আমলাদের মধ্যে একটু মন কষাকষিও হয়েছিল–কিন্তু আমি সে সব গ্রাহ্য করিনি। সবচেয়ে উপযুক্ত লোক বুঝেই হরিপদকে সেক্রেটারির পদ দিয়েছিলুম।

‘তারপর গত চার মাস ধরে হরিপদ খুব দক্ষতার সঙ্গেই সেক্রেটারির কাজ করে এসেছে, কখনও কোন ত্রুটি হয়নি। নিম্নতন কর্মচারীরা মাঝে মাঝে আমার কাছে তার নামে নালিশ করত, কিন্তু সে সব নিতান্তই বাজে নালিশ। হরিপদর নামে কলঙ্ক পড়েছিল বটে-জেলের দাগ সহজে মোছে না-কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চরিত্র যে একেবারে বদলে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় অভাবের তাড়নায় সে অসৎপথে গিয়েছিল, তাই অভাব দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্প্রবৃত্তিও কেটে গিয়েছিল। আমাদের জেলখানা খুঁজলে এই ধরনের কত লোক যে বেরোয় তার সংখ্যা নেই।

‘সে যা হোক, হঠাৎ গত মঙ্গলবারে যে ব্যাপার ঘটল তা একেবারে অভাবনীয়। খবরের কাগজে অল্পবিস্তর বিবরণ আপনারা পড়েছেন, তাতে যোগ করবার আমার বিশেষ কিছু নেই। সকালবেলা খবর পেলুম হরিপদ খুন হয়েছে। পুলিসে খবর পাঠিয়ে নিজে গেলুম তার বাসায়। দেখলুম, শোবার ঘরের মেঝোয় সে মরে পড়ে আছে; রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। হত্যাকারী তার গলাটা এমন ভয়ঙ্করভাবে কেটেছে যে ভাবতেও আতঙ্ক হয়। গলার নলী কেটে চিরে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। আপনারা অনেক হত্যাকাণ্ড নিশ্চয় দেখেছেন, কিন্তু এমন পাশবিক নৃশংসতা। কখনও দেখেছেন বলে বোধ হয় না।’

এই পর্যন্ত বলিয়া মহারাজ যেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তার দেহে আর কোথাও আঘাত ছিল না?'

মহারাজ বলিলেন, 'ছিল। তার বুকে ছুরির একটা আঘাত ছিল। ডাক্তার বলেন, ঐ আঘাতই মৃত্যুর কারণ। গলার আঘাতগুলো তার পরের। অর্থাৎ, হত্যাকারী প্রথমে তার বুকে ছুরি মেরে তাকে মমন্তিক আহত করে, তারপর তার গলা ঐ ভাবে ছিন্নভিন্ন করেছে। কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা, ভাবুন তো? আমি শুধু ভাবি, কি উন্মত্ত আক্রোশের বশে মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে এমন হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়।'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। মহারাজ বোধ করি মনুষ্য নামক অদ্ভুত জীবের অমানুষিক দুস্কৃতি করিবার অফুরন্ত শক্তির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল।

সহসা ব্যোমকেশের অর্ধ-মুদিত চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম—সেই দৃষ্টি! বহুবার দেখিয়াছি, ভুল হইবার নয়।

ব্যোমকেশ কোথাও একটা সূত্র পাইয়াছে।

মহারাজ অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি আপনাকে বললুম। এখন আমার ইচ্ছে, পুলিস যা পারে করুক, সেই সঙ্গে আপনিও আমার পক্ষ থেকে কাজ করুন। এতবড় একটা নৃশংস হত্যাকারী যদি ধরা না পড়ে, তাহলে সমাজের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কথা–আপনার কোন আপত্তি নেই তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। পুলিসের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই, বরঞ্চ বিশেষ প্রণয় আছে। আপত্তি কিসের?–আচ্ছা, হরিপদ শেষবার ক'বছর জেল খেটেছিল আপনি জানেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'হরিপদর মুখেই শুনেছিলুম, আইনের কয়েক ধারা মিলিয়ে তার চৌদ্দ বছর। জেল হয়েছিল; কিন্তু জেলে শান্তশিষ্ট ভাবে থাকলে কিছু সাজা মাপ হয়ে থাকে, তাই তাকে এগারো বছরের বেশি খাটতে হয়নি।'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লভাবে বলিল, 'বেশ চমৎকার! হরিপদ সম্বন্ধে আপনি আর কিছু বলতে পারেন না?'

মহারাজ বলিলেন, 'আপনি ঠিক কোন ধরনের কথা জানতে চান বলুন, দেখি যদি বলতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মৃত্যুর দু-চার দিন আগে তার আচার-ব্যবহারে এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন। কি, যা ঠিক স্বাভাবিক নয়?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছিলুম। মৃত্যুর তিন-চার দিন আগে একদিন সকালবেলা হরিপদ আমার কাছে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, কোন কারণে সে ভারি ভয় পেয়েছে।'

'সে সময় আর কেউ আপনার কাছে ছিল না?'

মহারাজ একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'সে সময় কতকগুলি ভিক্ষার্থীর আবেদন আমি দেখছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, একজন ভিক্ষার্থী তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।'

'তার সামেনই হরিপ অসুস্থ হয়ে পড়ে?'

'হ্যাঁ'।

একটু নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর কিছু? অন্য সময়ের কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না?'

মহারাজ প্রায় পাঁচ মিনিট গালে হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'একটা সামান্য কথা মনে পড়ছে। নিতান্তই অবাস্তর ঘটনা, তবু বলছি আপনার যদি সাহায্য হয়। আপনি বোধ হয় জানেন না, কয়েক বছর আগে আমার বাড়ি থেকে একটা দামী নীলা চুরি যায়—'

'জানি বৈকি।'

'জানেন? তাহলে এও নিশ্চয় জানেন যে, সেই নীলাটা ফিরে পাবার জন্যে আমি দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলুম?'

'তাও জানি। তবে সে ঘোষণা এখনও বলবৎ আছে কিনা জানি না।'

মহারাজ বলিলেন, 'ঠিক ঐ প্রশ্নই হরিপদ করেছিল। তখন সে আমার টাইপিস্ট, সবে মাত্র কাজে ঢুকেছে। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'মহারাজ, আপনার যে নীলাটা চুরি গিয়েছিল, সেটা এখন ফিরে পেলে কি আপনি দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন? তার প্রশ্নে কিছু আশ্চর্য হয়েছিলাম; কারণ এতদিন পরে নীলা ফিরে পাবার আর কোনও আশাই ছিল না, পুলিস আগেই হল ছেড়ে দিয়েছিল।'

'আপনি হরিপদর প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন?'

'বলেছিলুম, যদি নীলা ফিরে পাই নিশ্চয়ই দেব।'

ব্যোমকেশ তাড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি যদি আজ ঐ প্রশ্ন করি, তাহলে কি সেই উত্তরই দেবেন?'

মহারাজ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু–'

ব্যোমকেশ আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানতে চান?

মহারাতের হতবুদ্ধি ভাব আরও বর্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানেন নাকি?'

'জানি, তবে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা আমার কাজ নয়—সে কাজ পুলিস করুক। আমি শুধু তার নাম বলে দেব; তারপর তার বাড়ি তল্লাস করে প্রমাণ বার করা বোধ হয় শক্ত হবে না।'

অভিভূত কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, 'কিন্তু এ যে ভেল্কিবাজির মত মনে হচ্ছে। সত্যিই আপনি তার নাম জানেন? কি করে জানলেন?'

'আপাতত অনুমান মাত্র। তবে অনুমান মিথ্যে হবে না। হত্যাকারীর নাম হচ্ছে—রমানাথ নিয়োগী।'

'রমানাথ নিয়োগী! কিন্তু–কিন্তু নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'হবারই তো কথা। বছর দশেক আগে ইনিই আপনার নীলা চুরি করে জেলে গিয়েছিলেন, সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

'মনে পড়েছে। কিন্তু সে হরিপদকে খুন করলে কেন? হরিপদর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?'

'সম্বন্ধ আছে—পুরনো কয়েকটা নথি ঘাঁটলেই সেটা বেরুবে। কিন্তু মহারাজ, বেলা প্রায় এগারটা বাজে, আর আপনাকে ধরে রাখব না। বিকেলে চারটের সময় যদি দয়া করে আবার পায়ের ধুলো দেন তাহলে সব জানতে পারবেন। আর হয়তো নীলাটাও ফিরে পেতে পারেন। আমি ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

০২. হতভম্ব মহারাজ

হতভম্ব মহারাজকে বিদায় দিয়া ব্যোমকেশ নিজেও বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এত বেলায় তুমি আবার কোথায় চললে?’

সে বলিল, “বেরুতে হবে। জেলের কিছু পুরনো কাগজপত্র দেখা দরকার। তাছাড়া অন্য কাজও আছে। কখন ফিরব কিছু ঠিক নেই। যদি সময় পাই, হোটেলে খেয়ে নেব। ’ বলিয়া ছাতা ও বযাতি লইয়া বিরামহীন বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা তিনটা। জামা, জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, ‘বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া হয়নি। স্নান করে নিই। পুঁটিরাম, চট্ট করে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা কর। —আজি ম্যাটিনি-ঠিক চারটের সময় অভিনয় আরম্ভ হবে।’

বিস্মিতভাবে বলিলাম, ‘সে কি ! কিসের অভিনয়?’

ব্যোমকেশ বলিল, “ভয় নেই—এই ঘরেই অভিনয় হবে। অজিত, দর্শকের জন্যে আরও গোটাকয়েক চেয়ার এ ঘরে আনিয়া রাখা।’ বলিয়া স্নান-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

স্নানান্তে আহার করিতে বসিলে বলিলাম, ‘সমস্ত দিন কি করলে বল।’

ব্যোমকেশ অনেকখানি আমলেট মুখে পুরিয়া দিয়া তৃপ্তির সহিত চিবাইতে চিবাইতে বলিল, ‘জেল ডিপার্টমেন্টের অফিসে আমার এক বন্ধু আছেন, প্রথমে তাঁর কাছে গেলুম। সেখানে পুরনো রেকর্ড বার করে দেখা গেল যে, আমার অনুমান ভুল হয়নি।’

‘তোমার অনুমানটা কি?’

প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, ‘সেখানকার কাজ শেষ করে বুদ্ধুবাবু—থুড়ি—বিধুবাবুর কাছে গেলুম। হরিপদর খুনটা তাঁরই এলাকায় পড়ে। কেসের ইনচার্জ হচ্ছেন ইন্সপেক্টর পূর্ণবাবু। পূর্ণবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে এবং বিধুবাবুর পদদ্বয়ে যথোচিত তৈল প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত কযোদ্ধার হল।’

‘কিন্তু কার্যটা কি তাই যে আমি এখনও জানি না।’

‘কার্যটা হচ্ছে প্রথমত রমানাথ নিয়োগীর ঠিকানা বার করা এবং দ্বিতীয়ত তাকে গ্রেপ্তার করে তার বাসা খানাতল্লাস করা। ঠিকানা সহজেই বেরুল, কিন্তু খানাতল্লাসে বিশেষ ফল হল না। অবশ্য রমানাথের ঘর থেকে একটা ভীষণাকৃতি ছোরা বেরিয়েছে ; তাতে মানুষের রক্ত পাওয়া যায় কি না পরীক্ষার জন্যে পাঠান হয়েছে। কিন্তু যে জিনিস পাব আশা করেছিলুম তা পেলুম। না। লোকটার লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা অসামান্য।’

‘কি জিনিস?’

'মহারাজের নীলাটা।'

'তারপর? এখন কি করবে?'

'এখন অভিনয় করব। রমনাথের কুসংস্কারে ঘা দিয়ে দেখব। যদি কিছু ফল পাই—ঐ বোধ হয় মহারাজ এলেন। বাকি অভিনেতারাও এসে পড়ল বলে।' বলিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইল।

'আর কারা আসবে?'

'রমানাথ এবং তার রক্ষীরা।'

'তারা এখানে আসবে?'

'হ্যাঁ, বিধুবাবুর সঙ্গে সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছে। —পুঁটিরাম, খাবারের বাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না, মহারাজ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘড়িতে ঠং ঠেং করিয়া চরিটা বাজিল! দেখিলাম, মহারাজ রাজ্যোচিত শিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন।

মহারাজকে সমাদর করিয়া বসাইতে না বসাইতে আরও কয়েকজনের পদশব্দ শুনা গেল। পরীক্ষণেই বিধুবাবু, পূর্ণবাবু ও আরও দুইজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রমনাথ প্রবেশ করিল।

রমানাথের চেহারায় এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে; চুরি বিদ্যায় পারদশী হইতে হইলে বোধহয় চেহারাটি নিতান্ত চলনসই হওয়া দরকার। রমানাথের মাথায় ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, কপাল অপরিসর, চিবুক ছুঁচালো–চোখে সতর্ক চঞ্চলতা। তাহার গায়ে বহু বৎসরের পুরাতন (সম্ভবত জেলে যাইবার আগেকার) চামড়ার বোতাম আটা পাঁচ মিশালি রঙের স্পোর্টিং কোট ও পায়ে অপ্রত্যাশিত একজোড়া রবারের বুট জুতা দেখিয়া সহসা হাস্যরসের উদ্রেক হয়। ইনি যে একজন সাংঘাতিক ব্যক্তি সে সন্দেহ কাহারও মনে উদয় হয় না।

ব্যোমকেশ অঙ্গিলি নির্দেশে তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'মহারাজ, লোকটিকে চিনতে পারেন কি?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখন চিনতে পারছি। এই লোকটাই সেদিন ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল।'

'বেশ। এখন তাহলে আপনারা সকলে আসন গ্রহণ করুন। বিধুবাবু, মহারাজের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে। আসুন, আপনি মহারাজের পাশে বসুন। রমনাথ, তুমি এইখানে বস।' বলিয়া ব্যোমকেশ রমানাথকে টেবিলের ধারে একটা চেয়ার নির্দেশ করিয়া দিল।

রমানাথ বাঙনিস্পত্তি না করিয়া উপবেশন করিল। দুই জন সাব-ইন্সপেক্টর তাহার দুই পাশে বসিলেন। বিধুবাবু অভ্রভেদী গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কটমট করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। এই সম্পূর্ণ আইন-বিগর্হিত ব্যাপার ঘটিতে দিয়া তিনি যে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সকলে উপবিষ্ট হইলে ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিল। বলিল, 'আজ আমি আপনাদের একটা গল্প বলব। অজিতের গল্পের মত কাল্পনিক গল্প নয়-সত্য ঘটনা। যতদূর সম্ভব নির্ভুল ভাবেই বলবার চেষ্টা করব; যদি কোথাও ভুল হয়, রমানাথ সংশোধন করে দিতে পারবে। রমানাথ ছাড়া আর একজন। এ কাহিনী জানত, কিন্তু আজ সে বেঁচে নেই।'

এইটুকু ভূমিকা করিয়া ব্যোমকেশ তাহার গল্প আরম্ভ করিল। রমানাথের মুখ কিন্তু নির্বিকার হইয়া রহিল। সে মুখ তুলিল না, একটা কথা বলিল না, নির্লিপ্তভাবে আঙ্গুল দিয়া টেবিলের উপর দাগ কাটিতে লাগিল।

'রমানাথ জেলে যাবার পর থেকেই গল্প আরম্ভ করছি। রমানাথ জেলে গেল, কিন্তু মহারাজের নীলাটা সে কাছছাড়া করলে না, সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কি কৌশলে সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়ে গেল-তা আমি জানি না, জানিবার চেষ্টাও করিনি। রমানাথ ইচ্ছে করলে বলতে পারে।'

পলকের জন্য রমনাথ ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নিবিষ্ট মনে টেবিলে দাগ কাটিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'রামানাথ অনেক ভাল ভাল দামী জহরত চুরি করেছিল; কিন্তু তার মধ্যে থেকে কেবল মহারাজের রক্তমুখী নীলাটাই যে কেন সঙ্গে রেখেছিল তা অনুমান করাই দুষ্কর। সম্ভবত পাথরটার একটা সম্মোহন শক্তি, ছিল; জিনিসটা দেখতেও চমৎকার-গাঢ় নীল রঙের একটা হীরা, তার ভেতর থেকে রক্তের মত লাল রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। রমানাথ সেটাকে সঙ্গে নেবার লোভ সামলাতে পারেনি। পাথরটা খুব পয়মন্ত একথাও সম্ভবত রমানাথ শুনেছিল। দুর্নিয়তি যখন মানুষের সঙ্গ নেয়, তখন মানুষ তাকে বন্ধু বলেই ভুল করে।

'যা হোক, রমানাথ আলিপুর জেলে রইল। কিছুদিন পরে পুলিস জানতে পারল যে, নীলাটা তার কাছেই আছে। যথাসময়ে রমানাথের 'সেল খানাতল্লাস হল। রমানাথের সেলে আর একজন কয়েদী ছিল, তাকেও সার্চ করা হল। কিন্তু নীলা পাওয়া গেল না। কোথায় গেল নীলাটা?

'রমানাথের সেলে যে দ্বিতীয় কয়েদী ছিল তার নাম হরিপদ রক্ষিত। হরিপদ পুরনো ঘাগী আসামী, ছেলেবেলা থেকে জেল খেটেছে–তার অনেক গুণ ছিল। যাঁরা জেলের কয়েদী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তাঁরাই জানেন, এক জাতীয় কয়েদী আছে যারা নিজেদের গলার মধ্যে পকেট তৈরি করে। ব্যাপারটা শুনতে খুবই আশ্চর্য কিন্তু মিথ্যে নয়।

কয়েদীরা টাকাকড়ি জেলে নিয়ে যেতে পারে না; অথচ তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নেশাখের। তাই, ওয়াডারদের ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে মাদকদ্রব্য আনাবার জন্যে টাকার দরকার হয়। গলায় পকেট তৈরি করবার ফন্দি এই প্রয়োজন থেকেই উৎপন্ন হয়েছে; যারা কাঁচা বয়স থেকে জেলে আছে তাদের মধ্যেই এ জিনিসটা বেশি দেখা যায়। প্রবীণ পুলিস কর্মচারী মাত্রই এসব কথা জানেন।

'হরিপদ ছেলেবেলা থেকে জেল খাটছে, সে নিজের গলায় পকেট তৈরি করেছিল। রমানাথ যখন তার সেলে গিয়ে রইল। তখন দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল। ক্রমে হরিপদর পকেটের কথা রমানাথ জানতে পারল।

'তারপর একদিন হঠাৎ পুলিস জেলে হানা দিল। সেলের মধ্যে নীলা লুকোবার জায়গা নেই; রমানাথ নীলাটা হরিপদকে দিয়ে বললে, তুমি এখন গলার মধ্যে লুকিয়ে রাখ। হরিপদকে সে নীলাটা আগেই দেখিয়েছিল এবং হরিপদরও সেটার উপর দারুণ লোভ জন্মেছিল। সে নীলাটা নিয়েই টপ করে গিলে ফেলল; তার কণ্ঠনালীর মধ্যে নীলাটা গিয়ে রইল। বলা বাহুল্য, পুলিস এসে যখন তল্লাস করল। তখন কিছুই পেল না।

'এই ঘটনার পরদিনই হরিপদ হঠাৎ অন্য জেলে চালান হয়ে গেল, জেলের রেকর্ডে তার উল্লেখ আছে। হরিপদর ভারি সুবিধা হল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করল—যাবার আগে নীলাটা রমানাথকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল না। রমানাথ কিছু বলতে পারল না–চোরের মা'র কান্না কেউ শুনতে পায় না–সে মন গুমরে রয়ে গেল। মনে মনে তখন থেকেই বোধ করি ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্প অটতে লাগিল।'

এই সময় লক্ষ্য করিলাম, রমানাথের মুখের কোন বিকার ঘটে নাই বটে, কিন্তু রাগ ও গলার শিরা দপদপা করিতেছে, দুই চক্ষু রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিয়া চলিল, 'তারপর একে একে দশটি বছর কেটে গেছে। ছ'মাস আগে হরিপদ জেল থেকে মুক্তি পেল। মুক্তি পেয়েই সে মহারাজের কাছে এল। তার ইচ্ছে ছিল মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ক্রমে নীলাটা তাঁকে ফেরত দেবে। বিনামূল্যে নয়—দু'হাজার টাকা পুরস্কারের কথা সে জানত। ও নীলা অন্যত্র বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে হবে, তাই সে-চেষ্টাও সে করল না।

'কিন্তু প্রথম থেকেই মহারাজ তার প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করলেন যে, সে ভারি লজ্জায় পড়ে গেল। তবু সে একবার নীলার কথা মহারাজের কাছে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলার বদলে মহারাজের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে তার বিবেকে বেধে গেল। মহারাজের দয়ার গুণে হরিপদর মত লোকের মনেও যে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছিল, এটা বড় কম কথা নয়।

'ক্রমে হরিপদর দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। দশদিন আগে রমনাথ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরুল। হরিপদ কোথায় তা সে জানত না, কিন্তু এমনি দৈবের খেলা যে, চারদিন যেতে না যেতেই মহারাজের বাড়িতে রমানাথ তার দেখা পেয়ে গেল। রমানাথকে দেখার ফলেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বার তার আর কোনও কারণ ছিল না।

'যে প্রতিহিংসার আগুন দশ বছর ধরে রমনাথের বুকে ধিক ধিক জ্বলছিল, তা একেবারে দুর্বার হয়ে উঠল। হরিপদর বাড়ির সন্ধান সে সহজেই বার করল। তারপর সেদিন রাত্রে গিয়ে—'

এ পর্যন্ত ব্যোমকেশ সকলের দিকে ফিরিয়া গল্প বলিতেছিল, এখন বিদ্যুতের মত রমানাথের দিকে ফিরিল। রমানাথাও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া ছিল; ব্যোমকেশ তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চাপা তীব্র স্বরে বলিল, রমনাথ, সে-রত্রে হরিপদর গলা ছিঁড়ে তার কণ্ঠনালীর ভেতর থেকে তুমি নীলা বার করে নিয়েছিলে। সে নীলা কোথায়?'

রমানাথ ব্যোমকেশের চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইতে পারিল না। সে একবার জিহ্বা দ্বারা অধর লেহন করিল, একবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, তারপর যেন অসীম বলে নিজেকে ব্যোমকেশের সম্মোহন দৃষ্টির নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমি, আমি জানি না–হরিপদকে আমি খুন করিনি–হরিপদ কার নাম জানি না। নীলা আমার কাছে নেই—' বলিয়া আরক্ত বিদ্রোহী চক্ষে চাহিয়া সে দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশের অঙ্গুলি তখনও তাহার দিকে নির্দেশ করিয়া ছিল। আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন একটা মর্মগ্রাসী নাটকের অভিনয় দেখিতেছি, দুইটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি

পরস্পরের সহিত মরণাস্তক যুদ্ধ করিতেছে; শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হইবে তাহা দেখিবার একাগ্র আগ্রহে আমরা চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বরে একটা ভয়ঙ্কর দৈববাণীর সুর ঘনাইয়া আসিল; সে রমানাথের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পূর্ববৎ তীব্র অনুচ্চ স্বরে বলিল, রমানাথ, তুমি জানো না কী ভয়ানক অভিশপ্ত ওই রক্তমুখী নীলা! তাই ওর মোহ কাটাতে পারছ না। ভেবে দ্যাখ, যতদিন তুমি ঐ নীলা চুরি না করেছিলে, ততদিন তোমাকে কেউ ধরতে পারেনি–নীলা চুরি করেই তুমি জেলে গেলে। তারপর হরিপদর পরিণামটাও একবার ভেবে দ্যাখ। সে গলার মধ্যে নীলা লুকিয়ে রেখেছিল, তার গলার কী অবস্থা হয়েছিল তা তোমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। এখনও যদি নিজের ইষ্ট চাও, ঐ সর্বনাশা নীলা ফেরত দাও। নীলা নয়–ও কেউটে সাপের বিষ। যদি হাতে সে নীলা পর, তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে; যদি গলায় পর, ঐ নীলা ফাঁসির দড়ি হয়ে তোমার গলা চেপে ধরবে।'

অব্যক্ত একটা শব্দ করিয়া রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের ভিতর কিরূপ প্রবল আবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরাও সম্যক বুঝিতে পারি নাই। পাগলের মত সে একবার চারদিকে তাকাইল, তারপর নিজের কোটের চামড়ার বোটামটা সজোরে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'চাই না-চাই না! এই নাও নীলা, আমাকে বাঁচাও!' বলিয়া একটা দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ কপাল হইতে ঘাম মুছিল। দেখিলাম তাহার হাত কাঁপতেছে–ইচ্ছাশক্তির যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে নয়।

রমানাথের নিক্ষিপ্ত বোতামটা ঘরের কোণে গিয়া পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া তাহার খোলস ছাড়াইতে ছাড়াইতে ব্যোমকেশ স্খলিত-স্বরে বলিল, 'মহারাজ, এই নিন আপনার রক্তমুখী নীলা।'